*Journal of Cultural Research Studies, Vol-II Issue-2 (2023), p.14-22. (*ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে আদিবাসী প্রান্তিক জনজাতি ও বিপন্নতার স্বরূপ সন্ধান : নির্বাচিত গল্পকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা
সহ: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সারসংক্ষেপ:

এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে আদিবাসী সমাজ ও মানুষের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতির নানা চালচিত্রের কথা। আদিবাসী মানুষদের দুরাবস্থার কথা এই দেশে কারোরই অজানা নয়। এটি আজকের বহুচর্চিত একটি বিষয় বলা যায়। এই ভাবনা থেকেই হয়তো আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতির কথা আজ বাংলা সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই ধারাতেই আঞ্চলিক উপন্যাস এসেছে। সেই আদ্যিকাল থেকে এরা নানা ধরণের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। আজও তাদের কারণে-অকারণে শোষণ-বঞ্চনা-লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয়, অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী। তারা নগর সভ্যতা থেকে বহু দূরে প্রকৃতির কোলে নির্জনতার মধ্যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল নিরাপদে, নিশ্চিন্তে থাকবে বলে। কিন্তু বেশিদিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে নি। নানা সময়ে ভণ্ড, ঠক, অসৎ প্রবৃত্তিধারী মানুষদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে এই অরণ্য অঞ্চলগুলোতে। তারা এইসব সহজ সরল মানুষদের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দ্বিধা করেনি। অর্থলোভী পিশাচের দল জুলুমবাজির জন্য লক্ষ্যবস্তু করেছে এইসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের। তাদের অশিক্ষা, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রতি পদে ছলনা, প্রতারণা, বঞ্চনা করে গেছে। তাদের হাত ধরে তারা ভিটে মাটির মায়া কাটিয়ে অন্য জীবনে পাড়ি জমিয়েছে। এইরকম বিয়োগান্ত পরিণতির কথাই এই নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: *আদিবাসী সমাজ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক রীতি-নীতি, আর্থ সামাজিক অবস্থান, জীবন-জীবিকা -সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিপন্নতা, শাসন শোষণের স্বরূপ, আড়কাঠির ভূমিকা, বৃত্তিবদল ইত্যাদি।*

উপক্রমণিকা : প্রথমেই বলে রাখা ভাল আদিবাসীরা হল এদেশেরই একটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। হিন্দুদের মতো তারাও স্বতন্ত্র একটি জাতিগোষ্ঠী হলেও দুর্ভাগ্যের বিষয়, উপজাতি তকমা তাদের গায়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়। তারা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও একই ভাষায় ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে চলেছে। এই দেশে প্রায় দশ কোটির মতো আদিবাসী মানুষের বসবাস। অথচ স্বাধীন দেশে দেখি সব দিক দিয়ে আদিবাসী মানুষদের পরাধীন ও পরনির্ভরশীল করে ফেলে রাখা হয়েছে। যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদান কোন অংশে কম নয়। শাসক শ্রেণী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের অবদমিত

করে রেখেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এক প্রকার ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুস্থানি সংস্কৃতি তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কাজ দক্ষতার সাথে আজও এক শ্রেণির মানুষ করে চলেছে। পরিণতিতে আদিবাসীদের মধ্যে অনেকেই আজ ভুলতে বসেছে যে তারা আদিস্থানি। তারা পাকিস্থানি ও হিন্দুস্থানিদের চেয়ে স্বতন্ত্র একটি জাতিগোষ্ঠী। তাদের ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি সব দিক দিয়েই ভিন্নতর। এর দায় কার ! কেন এভাবে একটি আদিম জাতিকে সংকটের মুখে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়। এইভাবেই তাদের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতিতে পরিকল্পনা করে বিপর্যয় নামিয়ে আনা হয়। আর এই বিপর্যয়ের জন্য সুন্দরলালদের মত মানুষদের দায়ী করা যায়। যারা ছলে-বলে-কৌশলে আদিবাসীদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে পরনির্ভরশীল জীবন যাপনে বাধ্য করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় –

‘--- আমার কথা শোন। তোদের গাঁয়ে মড়ক লাগবে, হায়জা’র মড়ক! একটি প্রাণীও বাঁচবে না, মরে সব শেষ হয়ে যাবে। করম দেবতার রাগ পড়েছে, তোদের কাউকে রাখবে না, কাউকে নয়।

.....

উপায় আছে। নাঙা বাবার শিষ্য এই সাধু সুন্দরলালকে আঁকড়ে ধর। ও তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, ওর সঙ্গে তোরা উত্তরে যা। সেখানে তোরা ঘর পাবি, জমি পাবি, এরচেয়ে অনেক সুখে থাকবি।’ [১]

এইভাবে আদিবাসীদের মূল উপড়ে ফেলে তাদের ভাসমান শ্যাওলার মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর ছেড়ে আসা ভিটে মাটি বেহাত হয়ে যাওয়ায় পরে সুন্দরলালের সমাজের মানুষ তা হস্তগত করে নিজের করে নিয়েছে। এইভাবে বনাধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের জীবন জীবিকা ক্ষেত্রে বৃত্তি বদলে বাধ্য করা হয়েছে।

বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা :

প্রথমেই আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আদিবাসী জীবন ছিল বড় বিচিত্র ও রহস্যময়। তারা ছিল প্রকৃতির পূজারি ও স্বাধীনচেতা। আমরা সকলেই জানি আদিবাসী জীবন ও জীবিকা আগাগোড়া অরণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতির বরপুত্র হওয়ার কারণে একদিন অরণ্যনির্ভর জীবন যাপনের পন্থাকেই তারা বেছে নেয়। আদিবাসী ও অরণ্য যেন একে অপরের পরিপূরক। অরণ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক অনেকটা মাতা পুত্রের মতো। তাই আজও তারা অরণ্যধাত্রীকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে চায়। আদ্যিকাল থেকে অরণ্যই তাদের বল ভরসা সব কিছু। অর্থাৎ তাদের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বনই ছিল অরণ্য প্রকৃতি। তখন অরণ্য থেকে আহরিত কাঠ-পাতা-ফল-ফুল-মূল-মধু থেকেই তাদের সারা দিনের খোরাক হয়ে যেত। সাথে লাক্ষা চাষ, পশু পালন ও শিকার উপজীবিকা নিয়েই কোনো ক্রমে চলে যেত। এ থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রকৃতি নির্ভর জীবন জীবিকা নিয়ে তারা স্বনির্ভর ছিল। জীবিকা ক্ষেত্রে প্রকৃতি নির্ভরতাকে ছাড়িয়ে আজ মনুষ্য নির্ভর

হয়ে পড়েছে। বিপত্তির শুরু এখান থেকে। তখন থেকেই শাসন শোষণের শুরু বলা যায়। এদের জীবনের আজ চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে আড়কাঠিরা। পি. এন. মিশ্র ও সুন্দরলালেরা তাদেরই একজন --

'সুন্দরলাল হাত দেখতে জানে, যা বলে তা নাকি হুবহু মিলে যায় সব। শিকড়-বাকড় সম্বন্ধে তার প্রচুর জ্ঞান, বহু কঠিন রোগে তার ওষুধ নাকি অব্যর্থক্রিয়া দেখিয়ে দিয়েছে।' [২]

এইভাবেই তারা যুগে যুগে কালে কালে কৌশলে আদিবাসী পাড়ায় শেকড় গেঁড়ে জাঁকিয়ে বসে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে আদিবাসীদের মনে জায়গা পাওয়ার জন্য এরকম বুজরুকি করে থাকে। এটাই তাদের কারবার। এরপরে বিভ্রান্ত করার কাজ শুরু করে দেয়। কখনও প্রলোভন, কখনও ভয় দেখিয়ে তাদের আসামের চা বাগানে যেতে বাধ্য। এইভাবে ছলে-বলে-কৌশলে মূল ছিন্ন করে আদিবাসীদের দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পাচার করা হয়। অরণ্য নির্ভর জীবন-জীবিকার কথা ভুলে আজ তাদের মানুষের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছে। তাই জীবনে পদে পদে বাঁচার লড়াই জারি রয়েছে। জীবন-জীবিকার লড়াইয়ের পাশাপাশি সেদিন এরা দেশমুক্তির লড়াইয়েও পিছিয়ে ছিল না। তবু দেশ স্বাধীন হলে পরে প্রতিদানে ফাঁকি ছাড়া বিশেষ কিছু পায় নি। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ঝড়ু সাঁওতালদের মতো মানুষেরা। সে যে শোষিত বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিনিধি তার বেশভূষাই সেকথা জানান দেয় –

'......... ঝড়ু সাঁওতাল। গ্রামের লোকে মোড়ল বলে মান্য করে থাকে। পরণে বস্ত্রের বাহুল্য নেই শুধু ছোট একটি ফালি নেংটির মতো করে পরা। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোকে ঘিরে আর এক টুকরো কাপড়, তার একপাশে গোটা তিনেক পালক গোঁজা। হাতে বাঁশের ছিলা দেওয়া কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড একটা ধনুক, আর সেই সঙ্গে গোটা কয়েক বাঁটুল।' [৩]

স্বাধীন দেশে আদিবাসী মানুষেরা পদে পদে গাল ভরা প্রতিশ্রুতির সাথে ফাঁকি আর বঞ্চনা ছাড়া কিছুই পায় নি। মালিক শ্রেণী নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার অন্তিমে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আস্তাকুঁড়ের অন্ধকারের মধ্যে। অবশেষে তাদের ঠাঁই হয়েছে লোক চলাচলের অযোগ্য গ্রামের প্রান্তঃসীমায় অবস্থিত বনে-বাদাড়ে, নয়তো মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত কোনো জলাভূমি বা নদীর পাড়-পগারগুলিতে। সেইসব জায়গায় সাপখোপের সাথে লড়াই করে তারা তাদের বসতি গড়ে তুলে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। তাই অভিশপ্ত জীবনে প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রণা তাদের তাড়িয়ে বেড়ায় –

'পুত্রহারা মা ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে এখনো। তার ছেলেকে চুরি করে খেয়েছে শেয়ালে, আর খেয়েছে তার ঘরের পাশে বসেই। আকাশ ভরা এত আলো – এমন অকৃপণ সূর্য। রাত্রির অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে যায় এই আলো।' [৪]

এটাই তাদের জীবনের নিয়তি। অন্ধকারময় জীবনে আলোর দিশা এরা হয়তো কোনোদিনই খুঁজে পাবে না।

ছিন্নমূল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি সুন্দরলাল ও দেবীদাসের মত মানুষেরা। শকুনির নজর যেমন গো-ভাগাড়ের দিকে থাকে। তেমনি এদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সমাজের অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকা নিম্নবিত্ত মানুষদের দিকে। পরোপকারিতার নাম করে ভণ্ড ভেকধারীরা যে কোনো ছুতো নিয়ে এসে হামলে পড়ে কখনো সাঁওতাল পাড়ায় নয়তো মুচিপাড়ায়। অভাব অনটন না থাকলে যাদের আদিবাসী পাড়াগুলোতে আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এরা মনে প্রাণে অভাব অনটনকে জিইয়ে রাখতে চায়। যাদের আমরা পুঁজিবাদের দালাল বলে অভিহিত করতে পারি। এরা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের ভোগ্য পণ্য ছাড়া কিছু মনে করে না। তাই সময় সুযোগ বুঝে হানা দেয় আদিবাসী পাড়ায়। আর এদের আশ্রয় দিয়ে আদিবাসী মানুষেরা নিজেদের জীবন-জীবিকা–সংস্কৃতিকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এই সব ভণ্ড মানুষের আধিক্য দেখা দেয় সমাজে। যারা সহজ সরল মানুষদেরই লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছিল। যাদের আমরা ঠিকাদার বলে অভিহিত করতে পারি। আর লোকসমাজের মানুষের কাছে এরা আড়কাঠি বলে পরিচিত। এদের নজর আদিবাসী যুবতীদের উপর। আমরা আড়কাঠির প্রসঙ্গ আরণ্যক উপন্যাসে বিশদে পেয়েছি। সেখানে মঞ্চী নামে এক আদিবাসী নারীর জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতির কথাও জানতে পারি। আর এই পরিণতির জন্য সুন্দরলালের মতো নারী পাচারকারী মানুষদেরই দায়ী করা যায়। যাদের খপ্পরে পড়ে এইসব নারীরা অকালে হারিয়ে যায়। এমনই এক জীবন্ত চিত্র ধরা পড়েছে দুঃশাসন গল্পে –

‘ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একসঙ্গে চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি, ছল ছল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনখানে একফালি কাপড় নেই --- কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।’ [৫]

যুগ যুগান্তর ধরে সমাজের দুঃশাসনেরা এইভাবে আদিবাসী মানুষদের জীবন থেকে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নিতে দ্বিধা করেনি। তাদের নগ্ন করে ফেলে রেখে দিয়েছে। তাই এদের জীবন থেকে অভাব অনটন মুছে যায়নি। আজও অভাব-অনটনে জর্জরিত হয়ে জীবনযাপন করে চলেছে এরা।

আদিবাসীদের ঘর মানেই ভাঙা। পোশাক পরিচ্ছদ মানেই ছিন্নভিন্ন ফুটোফাটা। এদের জীবন মানেই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত। কোনোরকমে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে মেখে বেঁচে থাকার লড়াই জারি রেখেছে এরা। তবু এদের জীবনে শান্তি নেই। ধূমকেতুর মত কেউ না কেউ এসে হাজির হয়। সুন্দরলাল সংসারের মোহ কাটিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাঁওতালদের মাঝে গিয়ে উঠেছে। তার হাত ধরেই আমরা লোকায়ত সমাজের মানুষদের পেয়েছি। তাদের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, ধর্ম-কর্ম, জীবন-জীবিকার কথা জেনেছি। এরা কারোর সাথপাঁচে থাকে না। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাই সারাবছর কাজ নিয়ে পড়ে থাকে। আর পাল-পার্বণের দিনে নাচ-গানে মেতে ওঠে। সেরকম এক দৃশ্যের উল্লেখ এই গল্পে পাওয়া যায়। এদের সমাজে দলবদ্ধভাবে নাচ-গানের রীতি আগেও ছিল এখনও রয়েছে। বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে আদিবাসী মানুষেরা নানা সাজে সজ্জিত হয়ে বাঁধনছাড়া আনন্দে মেতে ওঠে। এই আনন্দধারায় শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নর-নারী, যুবক-যুবতী সবাই সামিল হয়ে থাকে।

'মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় বসেছে নাচের আসর। কষ্টিপাথরের তৈরী কালো চেহারার দুজন পুরুষ দুলে দুলে মাদলে ঘা দিচ্ছে, আর সেই মাদলের তালে ঝুঁকে ঝুঁকে কয়েকটি মেয়ে নৃত্য করছে। পরস্পরের বাহুতে তারা আবদ্ধ, মুখে অস্ফুট গানের উচ্ছ্বাস।' [৬]

তারপর মাদলের তালে তালে সবাই একই ছন্দে নাচতে থাকে। সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। নাচের তালে তালে তাদের ফুলগুলিও দুলতে থাকে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গীতের মহড়া দিয়ে থাকে। আর যুবতীরা তালে তাল মিলিয়ে তীব্র তানে ধুয়া দিয়ে সঙ্গ দেয়। এটাই আদিবাসী সংস্কৃতির বিশেষত্ব বলা যায়।

এই রকম সুন্দর পরিবেশে সুন্দরলালের মতো বহিরাগত জটিল কুটিল মানুষেরা বড় বেমানান। এখানে এসে সে তার প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে আদিবাসীদের। সে অলৌকিকতার কাঁধে ভর দিয়ে এদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। আদিবাসীদের ভাল যে কেউই চায় না, সুন্দরলালের মতো ভণ্ড বাঙালি চরিত্ররাই তার বড় প্রমাণ। এরা আসে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থকরণের জন্য। স্বার্থ সিদ্ধ হলেই আবার চলে যায়। আর মরণ হয় আদিবাসীদের। তখন তারা বাধ্য হয়ে বৃত্তিবদলের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখে। আজীবনকাল ধরে অভাব অনটনে জর্জরিত হয়ে এরা বহুকষ্টে জীবন যাপন করে চলেছে। এদের অবস্থা অনেকটা নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতো। এদের সংস্কৃতির আর এক বড় বৈশিষ্ট্য, কোন মানুষ বিপদে পড়লে তারা তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকে, তাকে তাড়িয়ে দেয় না। তার প্রমাণ সুন্দরলাল নিজে। সহজ সরল মন মানসিকতা হওয়ার কারণে এরা বিজাতীয়দের সহজে বিশ্বাস করে আশ্রয় দিয়ে থাকে। এটাকে এরা সামাজিক দায় বলে মনে করে। কিন্তু তার বিনিময়ে কোনো কিছু আশা করে না। তবু কোনো মহোদয় ব্যক্তি অর্থ দিলে ফিরিয়ে দেয় না। কিন্তু সুন্দরলালকে কখনওই মহোদয় বলা যায় না। তারা দিতে নয় হরণ করে নিতে আসে।

শহুরে সভ্যতায় হাঁফিয়ে ওঠা মানুষেরা এইভাবেই অরণ্যচারী আদিবাসী সভ্যতা-সংস্কৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে এই জীবনে এসে ভিড় জমায়। কিন্তু সুন্দরলাল অসাধু মানুষ, সে পর্যটনের উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। সে লুঠেরা তাই অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে এবং এদের জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছে। অনেকটা ভণ্ড ভেকধারি রাবণের মতো হরণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে সুন্দরলাল। এটা একরকমের জুলুমবাজি। এইসব কুচক্রী মানুষেরা কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এই সহজ সরল মানুষদের গ্রাম ও সমাজ ত্যাগে বাধ্য করেছে। সুন্দরলালও অনেকটা তেমনি, তার ভণ্ডামির পরিচয় প্রসঙ্গে বলতে হয় –

'সুন্দরলাল গেরুয়া নেয়নি বটে, তবু সে সন্ন্যাসী।' [৭]

এইরকম লোকেরাই খুব ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়। কিন্তু আদিবাসী মানুষেরা এদেরই বিশ্বাস করে বেশি। সে একজন ভণ্ড, ঠক, সুবিধাবাদী শ্রেণীর মানুষ বলে তাদের প্রতারণা করেছে। কথায় কথায় নানা অতিপ্রাকৃত গল্প বলে বিভ্রান্ত করে গেছে। তারা তাকে বিশ্বাসও করেছে। এদের সরলতার সুযোগ নিয়ে সে পদে পদে বঞ্চনা করে গেছে। এইরকম প্রকৃতির মানুষ আর যাই হোক সাধু হতে পারে না। সে একজন সাধারণ মানুষ অথচ এরা তাকে অন্য কিছু জ্ঞান করে। কৌশলে সে আদিবাসী মানুষদের মন জয় করে নেওয়ায় তারা তাকে সমাজে জায়গা

করে দেয়। এইভাবে অজান্তে তারা নিজেদের বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছে। তাদের দুর্বলতা জেনে নিয়ে সুন্দরলাল আরও বিপদে ফেলার প্যাঁচ কষেছে। তাদের নাচ গানের অনুষ্ঠানের দিনে উপদ্রবের মতো এসে হামলে পড়েছে। সেখানে নেশা করে সে যা করেছে তা কখনওই শোভনীয় নয়। কিন্তু তারা সেটাকে অলৌকিক কাণ্ড বলে চালিয়ে দিয়েছে।

'সাঁওতালেরা জানে মাঝে মাঝে তার উপরে ঠাকুর দেবতার ভর হয়।' [৮]

একদিকে কৌশলে সে বুধনীকে বিলাসবহুল জীবনযাপনের লোভ দেখিয়ে অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে অন্যদিকে ভাল সাজার জন্য সাঁওতালদের হাঁপানির ওষুধ বাতলে দিয়ে বাজিমাৎ করেছে বলা যায়। এই সামান্য অলৌকিক ঘটনার কারণে তারা তাকে গুরু ভেবেছে। লোকায়ত সমাজে গুরুবিদ্যার কথা সর্বজনবিদিত। সে নিজ মুখে পিশাচ চালান দেওয়ার কথা বলেছে –

'আর পিশাচ ! যে পিশাচ সিদ্ধ তার অসাধ্য কী আছে ? এই সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে পাহাড়ে কত অশরীরী প্রেতাত্মা ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায় কে বলতে পারে ? সন্ধ্যার কালো আবরণের তলায় যখন শালের বনগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখন তাদের বড় বড় খসখসে পাতার মর্মরে সেই প্রেতাত্মারা নিশ্বাস ফেলে যায়। সে নিশ্বাস যার গায়ে লাগে, গোড়াকাটা লতার মত শুকোতে শুকোতে একদিন শেষ আয়ুর বিন্দুটি অবধি তার মিলিয়ে যায় বাষ্প হয়ে। যেদিন রাত্রে পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঝড় ওঠে। মহুয়া গাছগুলো উপড়ে পড়ে, রাতচরা হরিণগুলো অবধি প্রাণের ভয়ে গমের ক্ষেতে নেমে আসে না --- সে রাত্রিতে তারা উৎসব করে। সে-সময় যদি কেউ একবার ভুল করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলে পরের দিন তার হাড় মাংসের একটি টুকরো কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত প্রেতাত্মা --- এই সমস্ত ভয়ঙ্কর পিশাচেরা সব সুন্দরলালের হাতধরা।' [৯]

আকালের দেশে খরা দেখা দিলে আর রক্ষে থাকে না। তখন এসব ভণ্ড, ঠক, অসৎ ব্যক্তিদের খপ্পরে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই শ্রেণির মানুষেরা সব সময় আদিবাসীদের জীবনে বিপদ নেমে আসুক এটা কামনা করে। যাতে তাদের কাছে হাত পেতে এই অসহায় মানুষগুলো দাঁড়ায়।

'লোকটা তবু নাছোড়বান্দা। দেবীদাসের পা আঁকড়ে ধরলে দু হাতে। চোখ দিয়ে এবার তার টপটপ করে জল পড়তে সুরু করেছে : আপনি ইচ্ছে করলে সব হয় বাবু।' [১০]

সমাজের মানুষের মুখে অন্ন জুগিয়ে চলেছে যারা তাদেরও বিপদের দিনে প্রতিদানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে তারা বেঁচে যায়। কিন্তু সুবিধাবাদী মানুষেরা তার বদলে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সামান্য কিছু দিয়ে এদের কিনে নিতে চায়। ফলস্বরূপ ভণ্ড অসাধু মানুষদের চক্রান্তে এদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয় ।

এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সব সময় আদিবাসী মানুষদেরই বারে বারে টার্গেট করা হয়। তাদের উপর আদ্যিকাল থেকে যে জুলুমবাজি হয়ে চলেছে তা আজও অব্যাহত রয়েছে। এদের অসহায়তার সুযোগকে এইসব আড়কাঠি বা ঠিকাদারেরা দারুণভাবে কাজে লাগায় । আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভাঙন নামিয়ে আনে যারা তাদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন সুন্দরলাল। কখনো কখনো নানা সুযোগ-সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন তো কখনো উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির রঙিন জগতের স্বপ্ন দেখিয়ে এই গর্হিত কাজ করে থাকে। তারা নিজের স্বার্থের কারণে সমগ্র সাঁওতাল সমাজের ক্ষতি করতে দ্বিধা করেনা।

এদের মধ্যে এসে প্রথমেই সে ভয়ের পরিবেশ কায়েম করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছে এই বলে –

'নাঙ্গা বাবা বললেন, যা ব্যাটা, তোর হয়ে গেছে। আজ থেকে সিদ্ধিলাভ করলি তুই। ভূত-পিরেত-পিশাচ-দানো তোর ছায়া দেখলেও ছুটে পালাতে পথ পাবে না।' [১১]

যাতে এই অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষেরা ভয়ে কিছু বলার সাহস না পায়। তাই সে অতি প্রাকৃত গল্প বলে এদের মন জয় করে নেয়। সে জানে এদের ভয় পাওয়াতে গেলে এটাই মোক্ষম অস্ত্র। এরা ভয়ের কাছে কাবু। কারণ এদের জীবনের সাথে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রয়েছে অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিকতা। তাই এদের সে ভয় পাইয়ে দিয়ে নিজের কাজে লাগাতে চেয়েছে। সে আসলে নারীলোলুপ, নারী পাচারকারী। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বুধনীর ওপর। তাকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। সাহেবের হাতে তুলে না দেওয়া অবধি তার শান্তি নেই।

'দু'মাস মাত্র সময় ---কিন্তু দুটি দিন মাত্র বেশি দেরি হয়ে গেলে সত্যিই কী আর ক্ষতি হবে! বাগানে অনেক মেয়ে আছে, কিন্তু বুধনীর জুড়ি নেই। সুন্দরলালের দুটো চোখে যেন গোখরো সাপ উঁকি মারতে লাগল। সায়েব ভাল জিনিসের কদর বোঝে, দুদিন বিলম্ব তার কাছে কিছুই নয়।' [১২]

কর্মগুণে সে নীলদর্পণ নাটকে পদীময়রানীর সমতুল্য। আগের কৌশলগুলো ব্যর্থ হলেও শেষ অস্ত্র দিয়ে মোক্ষম আঘাত হেনেছে। এটাকেও একধরণের জুলুমবাজি বলা চলে। ফলস্বরূপ আদিবাসী জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। আর ফাঁদে পড়ে সাঁওতাল আদিবাসীরা বহু পুরুষের ভিটে মাটির মায়া কাটিয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর জীবন বাধ্য হয়ে বরণ করে নিয়েছে। যে জীবন অনিশ্চয়তায় ভরা, বড় বন্ধুর, বড় ভয়ংকর। এইভাবে এদের বৃত্তিবদলের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কথক সত্যচরণকে এরা বিশ্বাস করেছিল। প্রতিদানে এরা অরণ্যভূমি হারিয়ে বন্ডেড লেবারের জীবন বরণ করে নেয়। ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের কথায় ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবনে বিপর্যয় নামিয়ে আনে। আর সুন্দরলালকে বিশ্বাস করে সর্বস্ব হারায়। ফলস্বরূপ ধর্ম-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা নেমে আসে। এরা অরণ্য নির্ভর জীবনযাপনে তুলনায় অনেক বেশি স্বনির্ভর ছিল। এখন এদের কৌশলে পরনির্ভরশীলতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। পরাধীন দেশে প্রথম স্বাধীনতার লড়াই শুরু করেছিল যারা তাদেরই আজ স্বাধীন দেশে নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলা হয়েছে। যেখান থেকে এরা কোনোদিনই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাই বাধ্য হয়ে অভাব অনটনে জর্জরিত হয়ে জীবনযাপন করে চলেছে।

এদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সংস্কার-বিশ্বাস। সেই সংস্কার-বিশ্বাস প্রসঙ্গে তুকতাক, বশীকরণের কথা উঠে আসে। এই প্রসঙ্গে আদিবাসীদের নানা ক্রিয়াকর্মের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই গল্পের সূত্রেও আমরা এই ধরণের ক্রিয়াকর্মের কথা অল্পবিস্তর পেয়ে থাকি। ভয়ের পরিবেশে থাকতে থাকতে

এদের মধ্যে এই জাতীয় বিশ্বাস তৈরি হয়ে গেছে। এরা জিন, ভূত-প্রেত, পিশাচ, ডাইনী বিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা, মন্ত্রশক্তি এসবে বিশ্বাস করে। এইরকমই একটি দৃশ্যের কথা তুলে ধরতে হয় ---

'বাণ মারা -----কী ভয়ানক! তুমি জানোও না ---মাটিতে রেখা দিয়ে তোমার মূর্তি আঁকা হয়ে গেল, আর সেই মূর্তির বুকে মেরে দেওয়া হল মন্ত্রঃপূত তীর; নিশ্চিন্ত মনে সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরেছ, হঠাৎ অসহ্য ব্যথা উঠল তোমার বুকে! তারপর কাশির সঙ্গে সঙ্গে তোমার ফুসফুস ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ---সাতটা দিনের ভেতরেই তুমি পুরোপুরি নিকাশ হয়ে গেলে।' [১৩]

এগুলো অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার যাই হোক না কেন এরা বিশ্বাস করে। ভয়ের পরিবেশে থাকতে থাকতে এসবের প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে। এগুলোকে লঙ্ঘন করার দুঃসাহস তারা দেখাতে পারে না। এদের জীবনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে রূপকথা, উপকথা, গালগল্প, সংস্কার-বিশ্বাস, ভয়-ভক্তি ইত্যাদি। অলৌকিক পরিবেশে থাকতে থাকতে এদের মনে এইসব ধ্যান-ধারণা গেঁড়ে বসে রয়েছে। এইরকম আলো আঁধারি পরিবেশে গা ছমছম করা শিহরণ জাগানো কাহিনি এই সমাজের মানুষেরা অস্বীকার করতে পারে না। আদিবাসীরা আত্মা, ভূতপ্রেত, ডাইনী-আনিজায় বিশ্বাস করে। তাই কখনো পিশাচের ভয় দেখিয়ে, কখনো ডাইনি অপবাদের দোহাই দিয়ে এদের জমি-ভিটে-মাটি ভোগ দখলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এদের জীবনে সাথে ডাইনি বিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা, তুকতাক, বশীকরণ, বাণমারা, পিশাচ চালান - এই কুবিদ্যা সমূহের প্রবল প্রভাব রয়েছে। এরা আজও এর বাইরে বের হয়ে আসতে পারে নি। পিশাচের কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ---

'যা মাঝি পরশু আসিস। ফুল আর সিঁদুর মনে থাকে। আর একটা কথা। এরপরে কিন্তু ক'দিন তোকে গাঁয়ের বাইরে আর কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। ডোমনের রক্ত খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পিশাচটা আশে পাশে খুঁজে বেড়াবে তোকে। পেলে কিন্তু আর রক্ষে থাকবে না।' [১4]

এই ভয়ে তারা ভিটে মাটির মায়া কাটিয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে চলে যায়। পরিবার পরিজনদের ছেড়ে পালিয়ে বেড়ায়।

উপসংহারে:

এসে একথাই বলতে হয়, এই নিয়েই এদের জীবন। আজও তার বাইরে এরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। আর সেই সুযোগ আজকে সুন্দরলালের উত্তরসূরীরা কাজে লাগিয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সাঁওতালদের জীবনের সাথে জড়িয়ে তাদের সর্বস্ব লুটে চলেছে। এদের ঠকানো খুব সহজ, ভোলানো খুব সহজ। এইসব মানুষেরাই লোকজীবনে বেশি মান্যতা পেয়ে থাকে। এদের সাথে বুজরুকি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। এদের কারণেই আদিবাসীরা আজ সব কিছু হারিয়ে বসেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. গঙ্গোপাধ্যায়ের, নারায়ণ (১৯৫৪), শ্রেষ্ঠগল্প, জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রকাশভবন, বীতংস পৃষ্ঠা ২৮

২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৯

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২০

৪. দুঃশাসন, পৃষ্ঠা ৫৮

৫. গঙ্গোপাধ্যায়ের, নারায়ণ (১৯৫৪), শ্রেষ্ঠগল্প, জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রকাশভবন, দুঃশাসন পৃষ্ঠা ৫৮ ৫১

৬. বীতংস পৃষ্ঠা ২১

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১৯

৮. তদেব, পৃষ্ঠা -২৪

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪-২৫

১০. দুঃশাসন, পৃষ্ঠা ৫৮

১১. বীতংস পৃষ্ঠা ২৪

১২. তদেব, পৃষ্ঠা ২৬

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ২৫